মূলপাতা

# সভ্যতা ও অবক্ষয়

Asif Adnan

2020-08-08 21:55:58 +0600 +0600

28 MIN READ

খবরগুলো নিয়মিত বিরতিতে সামনে আসে। পশ্চিমের নানা যৌন বিকৃতির বিচিত্র সব গল্প। সমকামিতা, উভকামিতা, শিশুকামিতা, পশুকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডার আরো কতো কী। আমরা হেসে এড়িয়ে কিংবা ভুলে যাই। অথবা পশ্চিমাদের অসভ্যতা নিয়ে ধরাবাঁধা কিছু কথা বলি। অন্য কিছু খবরও নিয়মিত বিরতিতে চোখে পড়ে। দেশে ক্রমাগত বাড়তে থাকা ডিভোর্স, গর্ভপাত আর লিভ টুগেদার নিয়ে 'চাঞ্চল্যকর' বিভিন্ন প্রতিবেদন। মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় লেইট নাইট পার্টি, কিংবা সমকামিদের বিভিন্ন 'গেট টুগেদারের' কথা। আর প্রতিনিয়তই পত্রিকায়, রাস্তায়, বিলবোর্ডে, টিভি স্ক্রিনে, ব্রাউযার খুললেই চোখে পড়ে নতুন কোন বিজ্ঞাপন, সাহসি কোন সিনেমা কিংবা দৃশ্য নিয়ে প্রতিবেদন, ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি, নারী দেহের পণ্যায়ন, নারীর নিজেকে প্রদর্শন, আদিম হাস্যরসে মেতে ওঠা আড্ডাবাজদের হাসি, পথচারীর আড়চোখের দৃষ্টি, পুঁজিবাদের যৌনকরণ, হুকআপ কালচার নিয়ে জমে ওঠা অনলাইন বিতর্ক, ভাইরাল কোন ভিডিও, কিংবা কোন সুশীল বুদ্ধিজীবির কলাম—চোখ খুললেই চোখে পড়ে যৌনতা নিয়ে অবসেসড, যৌনন্মাদ এক সমাজ।

কেন?

যৌনতার ব্যাপারে বর্তমানে আমরা যেসব প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করা, এড়িয়ে যাওয়া কিংবা ধরাবাঁধা কিছু কথা বলে দায়িত্ব শেষ করা সহজ। নৈতিক এই বিপর্যয়কে দেখিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার নোংরামি তুলে ধরা কার্যকর। কিন্তু এই অবস্থা যে আরো গভীর ও মৌলিক কোন সমস্যার উপসর্গ এবং এই বাস্তবতা যে আরো কঠিন কোন পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে—সেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, অথবা আমরা বিষয়টাকে সেভাবে দেখি না। সেই গভীর ও মৌলিক সমস্যা, সেই কঠিন পরিণতি কী—সেই আলোচনায় আমরা যাবো। তবে তার আগে আমাদের জানতে হবে—ঠিক কীভাবে, কোন পথে, আমরা আজকের এই অবস্থায় এসে পৌছলাম।

## 'বিপ্লবের' বংশগতি

যৌনতা ও নৈতিকতার ব্যাপারে আজ আমরা যে অবস্থা দেখছি—সমকামি 'বিয়ের' আইনী স্বীকৃতি, সমকামিতাকে প্রশংসনীয় সাব্যস্ত করা, ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্ট, বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার ব্যাপক প্রচলন, ব্যাপক গর্ভপাত, বিয়ে ও পরিবারের পবিত্রতা—এগুলোর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শিশুকাম, পশুকাম, অজাচারসহ বিভিন্ন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা—এই সবকিছুই ষাট ও সত্তরের দশকের সেক্সুয়াল রেভোলুশানের ফসল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে বৈশ্বিক পরাশক্তি এবং সাদা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে অ্যামেরিকার। এ সময়কার প্রজন্মকে বলা হয় 'দা গ্রেইটেস্ট জেনারেইশান'। ১৯০০ থেকে ১৯২০ এর মাঝে জন্ম নেয়া এই 'গ্রেইটেস্ট জেনারেশনই দূরদেশে গিয়ে লড়াই করেছিল বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বদলে দেয়া মহাযুদ্ধে। আর যারা দেশে ছিল তারা সচল রেখেছিল যুদ্ধকালীন অর্থনীতির চাকা। মহাযুদ্ধের বিজয়ী এ প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল বিশের দশকের ভয়ঙ্কর মন্দা, নানা সামাজিক অস্থিরতা আর যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে। এ প্রজন্ম ছিল পরিশ্রমী, বাস্তবমুখী এবং তাদের নৈতিকতা ছিল ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক প্রগাঢ় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঝড় সবকিছু আমূল বদলে দেয়। পঞ্চাশের দশকের বিট জেনারেইশান আর ষাটের দশকের হিপি মুভমেন্ট আগের প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া চিন্তাগুলোকে আক্রমণ করতে শুরু করে। রক অ্যান্ড রৌল, হলিউড, প্লেবয়, পেন্টহাউস, অ্যাকাডেমিয়া আর ম্যাস মিডিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব। 'মহান' প্রজন্মের সন্তানরা বেড়ে ওঠে জীবন ও নৈতিকতার প্রতি সম্পূর্ণ নতুন, প্রায় বিপরীতমুখী এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।। চিন্তা, চেতনা, আদর্শ ও

দর্শনে দুই প্রজন্মের মাঝে তৈরি হয় এক গভীর বিভাজন। আর এর এ বিভক্তি তুঙ্গে পৌছায় সেক্সুয়াল রেভোলুশানের মাধ্যমে, যখন যৌনতার ব্যাপারে গ্রেইটেস্ট জেনারেশানের ধর্মীয় নৈতিকতা ছুড়ে ফেলে অ্যামেরিকা আলিঙ্গন করে নেয় ফ্রি সেক্সের প্যাইগান দর্শনকে। এ প্রজন্মের চিন্তায় গেঁথে যায় সব ধরনের যৌনাচার আর বিকৃতির অবাধ প্রচলন ও বৈধতার এক দর্শন। পরবর্তী ৫০ বছরে এই সেক্সুয়াল রেভোলুশনেরই নানা ফসল বিভিন্নভাবে আমাদের আজকের এই বাস্তবতাকে তৈরি করেছে।

ষাটের দশকের শেষদিকে শুরু হওয়া সেক্সুয়াল রেভোলুশানের ভিত কিন্তু স্থাপিত হয় আরো আগে। সেক্সুয়াল রেভোলুশান নামের সভ্যতার অবৈধ এ সন্তানের বংশগতি খুব সংক্ষেপে ও সিমপ্লিফাই করে এভাবে উপস্থাপন করা যায়—

মানুষের মনোদৈহিক প্রায় সব ধরনের সমস্যার কারণ হিসেবে অবদমিত কামনাবাসনা তথা যৌনতাকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সেক্সুয়াল রেভোলুশানের প্রাথমিক কাঠামো দাঁড় করায় সাইকোঅ্যানালাইসিসের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড। মানুষের ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অনুপ্রেরণা—প্রায় সবকিছুর পেছনে ফ্রয়েড যৌনতা খুঁজে পায়। ফ্রয়েডের মতে মানবজীবনের সব আনন্দ ও কষ্টের সম্পর্কলিবিডোর (যৌনতাড়না) সাথে। এমনকি শিশুকেও ফ্রয়েড আবিষ্কার করে যৌন প্রাণী হিসেবে। ফ্রয়েডের চিন্তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায় উইলহেম রাইশ এবং হার্বার্ট মারকিউসের মতো লোকেরা। তবে ফ্রয়েডের তৈরি করা কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে যে মানুষটি সত্যিকার অর্থে সেক্সুয়াল রেভোলুশান এবং আমাদের আজকের এই যৌনন্মাদ সমাজের জন্ম দেয় তার নাম অ্যালফ্রেড কিনসি। রকাফেলার ফাউন্ডেইশানের সমর্থন নিয়ে কিনসি ফ্রয়েডের চিন্তার সাথে যুক্ত করে নতুন এক দিক।

কিনসি দাবি করে মানুষের যৌনতা নির্দিষ্ট কোন কাঠামোতে আবদ্ধ না। মানব যৌনতা ক্রমপরিবর্তনশীল, বহমান। কিনসির মতে, যৌনতার ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের কোন ধারণা নেই। যৌনতা সাদাকালো বাইনারি কোন সিস্টেম না, বরং মানুষের যৌনতা রংধনুর মতো। এখানে আছে অনেক রঙ, অনেক মাত্রা। রংধনুর একপ্রান্তে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা আর অন্য প্রান্তে সমকামিতা। এ দুইয়ের মাঝে আছে শিশুকামিতা, পশুকামিতা, উভকামিতা থেকে শুরু করে সবধরনের ফেটিশ, সবধরনের বিকৃতি। সমাজের মানুষেরা একেকজন এই স্পেকট্রাম বা বর্ণালীর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে। আবার একজন মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বর্ণালীর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে পারে। তবে কিনসির মতে অধিকাংশ মানুষ দুই প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থানের দিকে থাকে, অর্থাৎ উভকামিতায়। কিন্তু সমাজ, সংস্কার ও ধর্মের মাধ্যমে আরোপিত নৈতিকতার কারণ মানুষ এই স্বাভাবিক অবাধ যৌনতার প্রবণতাকে চেপে রাখে। একে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে অথবা নিজের আসল যৌনাচারকে গোপন রেখে সমাজের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাভাবিকতার মুখোশ পড়ে থাকে। পাশাপাশি কিনসি তার কুখ্যাত দুটি বইয়ের (Sexual Behavior In The Human Male/Female) মাধ্যমে 'প্রমাণ' করে দেখায় যে, যেগুলোকে আমরা বিকৃত যৌনতা বলি সেগুলো আসলে অনেক বেশি প্রচলিত। সমকামিতা, উভকামিতা, বহুগামিতাসহ—অনেক কিছুই সমাজের অনেকেই করে। কিন্তু তারা সেটা গোপন রাখে। ঐ যে, পাছে লোকে কিছু বলে!

এই দাবির পক্ষে কিনসি বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। যদিও কিনসির উপস্থাপিত পরিসংখ্যান দিয়ে তার দাবি প্রমাণিত হয়, কিন্তু আসল ফাঁকিটা ছিল তার পরিসংখ্যানেই। কিনসি যাদের সাক্ষাতকার নিয়েছিল তাদের মধ্যে বিশাল একটি অংশ ছিল পতিতা, সমকামি পুরুষ পতিতা (পতিত?), সমকামি, যৌন অপরাধের কারণে কারাভোগকারী, এবং পেডোফাইল। অর্থাৎ কিনসি প্রশ্ন করার জন্য এমনভাবে মানুষ বেছে নিয়েছিল যাতে বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত মানুষদের অনুপাত বেশি হয়। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন। আপনি যদি চুরির ওপর বাংলাদেশের ১০০ জন মানুষের ওপর জরিপ চালান, আর ইচ্ছে করেই সেখানে ৫০ জন চোরকে রাখেন তাহলে অবশ্যই আপনার জরিপের ফলাফলে দেখা যাবে বাংলাদেশের প্রায় ৪০-৫০% মানুষের মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে। কিনসি ঠিক এ কাজটাই করেছিল।

তবে এখন আমরা এখন বলতে পারলেও গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ কাজটা এতোটা সহজ ছিল না। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে আর পঞ্চাশের দশকে কিনসির 'রিসার্চ' ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। রকাফেলার ফাউন্ডেশানের প্রত্যক্ষ অর্থায়ন ও সমর্থনে অ্যামেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে কিনসি নানা সেমিনারে নিজের আবিষ্কৃত 'বৈজ্ঞানিক সত্য'গুলো প্রচার করতে দাঁড়ায়। তার বইগুলো পরিণত হয় বেস্টসেলারে এবং কিনসির এই জালিয়াতি ভরা গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে যৌনতার

ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি। কিনসির উপসংহারের ওপর ভিত্তি করে স্কুলের যৌনশিক্ষা বই এবং আইন পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়। সেক্সুয়াল রেভোলুশানের দুজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়ার, প্লেবয় ম্যাগাযিনের হিউ হেফনার এবং সমকামি অধিকার আন্দোলনের হ্যার হেই—গভীরভাবে কিনসির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। দুজনের ভাষ্যমতেই কিনসি Sexual Behavior In The Human Male—বইটি ছিল তাদের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট, এবং এই বইটি পড়ার পরেই তারা নিজেদের জীবনের গতিপথ বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিনসির দেয়া ন্যায়-অন্যায় থেকে মুক্ত যৌনতার বর্ণালীতে নতুন একটি অক্ষ যোগ করে জন্স হপকিন্সের ড. জন মানি। যৌনতা (sexual preference), লিঙ্গ (gender) ও লৈঙ্গিক পরিচিতি (gender identity)—এর মাঝে মানি পার্থক্য খুঁজে বের করে। মানুষের যৌনতা ও লৈঙ্গিক পরিচয় জন্মগতভাবে নির্ধারিত না। মানুষের ধরাবাঁধা কোন যৌনতা ও লৈঙ্গিক পরিচয় নেই। যৌনতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বিকৃতি, অবিকৃতি বলে কিছু নেই—আধুনিক যৌনতার ধারণায় এই চিন্তাগুলো যুক্ত করার মাধ্যমে জন মানি বর্তমানের ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্টের মূল দাবিগুলোর ব্যাখ্যা তৈরি করে। অন্যদিকে ফ্রয়েড, মার্ক্স আর রাইশের চিন্তার সমন্বয় করার মাধ্যমে কালচারাল মার্ক্সিসম ও আইডেন্টিটি পলিটিক্সের ছাঁচে সমকামিতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারের স্বাভাবিকীকরণের আন্দোলনের জন্য একটি আদর্শিক কাঠামো তৈরি করে ফ্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের হার্বাট মারকিউস।

কিনসি ও বিশেষ করে মানির কাছ থেকে আসা ধারণাগুলো লুফে নেয় ষাট ও সত্তরের দশকে তুঙ্গে থাকা ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট। এই যে "বৈজ্ঞানিক প্রমাণ' পাওয়া গেছে, নারী ও পুরুষ আসলে একই। তাদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পুরুষ যা পারে নারীও তা পারে। পুরুষ ও নারীর চিন্তা, সামর্থ্য, সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকার যে পার্থক্য সমাজে আছে তা জোর করে চাপিয়ে দেয়া। পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে এসব ধারণা গড়ে উঠেছে।। যুগে যুগে পুরুষরা ষড়যন্ত্র করে এসবের মাধ্যমে নারীদের ঘরে বেঁধে রেখেছে। প্রথা, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদিকে তারা ব্যবহার করেছে নারীদের আবদ্ধ রাখার জন্যে।

নারীবাদে এসে সাইকোলজি, সেক্সোলজি, বিকৃতি, মানবিক পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির অদ্ভুত এক জগাখিচুড়ি তৈরি হয়। যৌনতা, পরিবার, মানবপ্রকৃতিসহ যেকোন কিছুকেই নির্দিষ্ট সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ফসল হিসেবে দেখানোর পোস্টমর্ডানিস্ট যুক্তিও তারা গ্রহণ করে। যার ফলে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত ধারনাগুলোকে আউটডেইটেড বলে নাকচ করে দেয়া সম্ভব হয়। এর সাথে আরো যুক্ত হয় আপেক্ষিত নৈতিকতা (moral relativism) এবং কোন চিরন্তন সত্যের অস্তিত্ব থাকাকে অস্বীকার করার প্রবণতা। ভালো ও খারাপের কোন ধরাবাধা সংজ্ঞা নেই, মানুষই ভালো-মন্দের তৈরি করে। সময়ের সাথে ভালো ও খারাপ বদলাতে থাকে। সকল সত্যই আপেক্ষিক, প্রতিটি সত্যই কেবল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও শক্তির কাঠামোর সাপেক্ষে সত্য—আপেক্ষিক নৈতিকতা ও আপেক্ষিত সত্যের অপ্রকৃতস্থ ধারণার ওপর গড়ে ওঠা এসব পোস্টমর্ডানিস্ট তর্কের মাধ্যমে সম্ভব হয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, বিকৃতি এমনকি বায়োলজিকেও একপাশে সরিয়ে রাখা। ধাপে ধাপে ডিকন্সট্রাক্ট করা হয় গ্রেইটেস্ট জেনারেইশনের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও দর্শনকে।

নারীবাদ আক্রমণ করে পরিবারকে। কারণ পরিবার হল পুরুষতন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার। পরিবার একটি 'পুরুষতান্ত্রিক' কাঠামো যার উদ্দেশ্য নারীকে ঘরে আটকে রেখে পুরুষের আধিপত্য নিশ্চিত করা। নারীবাদ নারীকে শেখাতে শুরু করে, 'একজন নারীর পুরুষের কোন দরকার নেই। প্রয়োজন নেই পরিবারের মধ্যে নিজের পরিচয় বা পূর্ণতা খোঁজার। সন্তান তোমাকে শুধু আরো পিছিয়ে দেবে। বরং তোমার উচিত নিজের স্বাতন্ত্র্য, নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের ক্যারিয়ারের মাঝে সাফল্য খোঁজা। আর শরীরের চাহিদা? সেক্স? তার জন্য বিয়ের কী দরকার? সেক্স শুধু শরীরের জন্য, আনন্দের জন্য। যা ইচ্ছে করো, কিন্তু এর সাথে আর কোন কিছু জড়ানোর প্রয়োজন নেই। বহুগামীতাকে স্বাধীনতা হিসেবে দেখার এই প্রবণতাও নারীবাদ গ্রহণ করে সেক্সুয়াল রেভোলুশানের কাছ থেকে। নারীবাদের ভাষায় বার্থ কন্ট্রোল পিলসহ অন্যান্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও যেকোন সময়ে গর্ভপাতের সুযোগ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারীকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেয়। আর এভাবেই সব শেকল থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতা পরিণত হয় নিছক আনন্দের এক অতৃপ্ত অন্বেষণে।

ষাটের দশকের শেষদিকে এবং সত্তরের দশকের শুরুর দিকে শুরু হওয়া ফ্রি লাভ/ফ্রি সেক্স মুভমেন্ট ও সমকামি অধিকার আন্দোলনও পুরোপুরিভাবে এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তাদের জন্য এটা একটা সহজ সিদ্ধান্ত ছিল। প্রচলিত পরিবার কাঠামো, নৈতিকতা, যৌনতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি—এসবকিছুই সমকামি ও অন্যান্য বিকৃতকামীদের আচরণ ও দর্শনের সাথে মেলে না। কিন্তু সমকামিতা বা বিকৃতকামিতার জায়গা থেকে পরিবার বা নৈতিকতার সমালোচনা করা স্ট্র্যাটিজিকালি ভুল। এতে করে সমকামিরা যে অচ্ছুৎ, সমাজবিরোধী—এই ধারণাই আরো শক্ত হবে। কিন্তু স্ট্র্যাটিজিক হিসেবনিকেশের কারণে সমকামিরা যা প্রকাশ্যে বলতে পারছিল না, খুব সহজ সেই কাজটা করতে পারছিল নারীবাদীরা। তাই সমকামি আন্দোলনের সাথে নারীবাদীদের জোট বাধা ছিল যৌক্তিক এবং স্বাভাবিক। এই দুই আন্দোলন আজও হাতে হাত রেখেই চলছে।

ষাট ও সত্তরের দশকে যা ছিল (নৈতিকতা, পরিবার, যৌনতা ইতাদির ব্যাপারে) খুব র‍্যাডিকাল 'বিপ্লবী চিন্তা, পরের দশকগুলোতে সেগুলোই ধীরে ধীরে স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হয়। কিনসি, মানি ও মারকিউসদের দর্শন আর ফেমিনিস্ট থিওরিগুলো অবিসংবাদিত সত্য হিসেবে শেখানো হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ওপর এই চিন্তাধারা প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। আর বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষের চিন্তায় এ বিশ্বাসগুলো গেঁথে দিতে থাকে ম্যাস মিডিয়া। এই কলুষিত দর্শন, চিন্তার বিকৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে।

এই মিশ্রণ থেকেই একসময় বের হয়ে আসে হেজেমনিক ও টক্সিক ম্যাস্কিউলিনিটি-র ধারণা। টক্সিক ম্যাসকিউলিনিটির এ তত্ত্ব দাবি করে, যা কিছুকে স্বাভাবিকভাবে পুরুষালি বলে গণ্য করা হয়, যেসব আচারআচরণ ও বৈশিষ্ট্যকে সমাজ পুরুষোচিত বলে উপস্থাপন করে, তার সবই বিষাক্ত। কারণ পুরুষত্বের এই ধারণা তৈরিই হয়েছে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। এই 'পুরুষত্ব' মানবতার জন্য ক্ষতিকর। সত্তাগতভাবেই এই 'পুরুষ' অত্যাচারী, সম্ভাব্য ধর্ষক, সমাজ ও সভ্যতাকে কলুষিতকারী। এভাবে নারীবাদ পুরুষত্বের ধারণাকেই আক্রমণ করে বসে আর এর মাধ্যমে অনিচ্ছায় ও অজান্তে আক্রমণ করে নারীত্বকেও। এ পর্যায়ে এসে নারীবাদ দাবি করে, যা কিছু নারীসুলভ বলে স্বীকৃত তা আসলে পুরুষতন্ত্রের ফসল। নারী তখনই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হবে, যখন সে পুরুষতন্ত্রের তৈরি ছাঁচ থেকে বের হতে পারবে। আর পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত তখনই পূর্ণ হবে যখন সে সমাজস্বীকৃত পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্য ঝেড়ে ফেলবে আর নিজের পুরুষ পরিচয় আর ঐতিহাসিক 'অপরাধের' কারণে লজ্জিত হবে। তাই, যদি পুরুষ কর্তৃত্বশীল হয় তাহলে সে অত্যাচারী। যদি সে দৃঢ়চেতা হয়, সমাজস্বীকৃত পুরুষোচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তাহলে সে নারীর ওপর অত্যাচার ও শোষণের এই ফ্রেইমওয়ার্কের একটি অংশ। একইভাবে, যদি নারী সাবমিসিভ হয় তাহলে সে পুরুষতন্ত্রের গোলাম, ব্রেইনওয়াশড। যদি নারী মা ও স্ত্রী হিসেবে নিজের পরিচিত বেছে নেয় তাহলে সে বিষাক্ত পুরুষতন্ত্রের ফসল। যদি পুরুষ বিশ্বস্ততা আশা করে তাহলে সেটা ভন্ডামি, যদি নারী বিশ্বস্ত থাকতে চায় তাহলে সে মানসিক দাসত্বের স্বীকার।

নৈতিকতা, যৌনতা ইত্যাদির ব্যাপারে যতো ধারণা আছে, ভালোমন্দ, বৈধ-অবৈধ, বিকৃতি, স্বাভাবিকতা—সব কিছুই কলুষিত পুরুষতন্ত্র এবং ঐতিহাসিক শোষণ ও নির্যাতনের ফসল। সমকামিতা তাই শুধু যৌন সুখের সন্ধান না বরং নিজের স্বাধীনতার প্রয়োগ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একইভাবে বহুগামী নারী হল আধুনিক এক বিপ্লবী। আর দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় বিপ্লব হল অ্যান্ড্রোজিনি—ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্ট। কারণ এ আন্দোলন সব প্রথা, প্রচলন আর কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ করছে। পুরুষত্বের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে পথের শুরু তার পরিসমাপ্তি অ্যান্ড্রোজিনি। টক্সিক ম্যাসকিউলিনিটি তত্ত্বের ফসল হল ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্ট।

এখানে একটি বিষয় বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে বিকৃতকামীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে—ব্যাপারটা এমন না। সব সমাজেই এরা খুব ছোট একটা মাইনরিটি। কিন্তু পার্থক্য হল যৌনতার ব্যাপারে তাদের ধ্যানধারণাগুলো বিপুল সংখ্যক মানুষ মেনে নিয়েছে। মোটা দাগে এই সভ্যতা যৌনতার ব্যাপারে এই দর্শনকে গ্রহণ করেছে। যৌনতাকে এখন এভাবেই দেখা হচ্ছে, সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। সমকামি অধিকার, ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকারের নামে এসব বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের কাজ করা হচ্ছে জাতিসংঘের মতো সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। আর এভাবেই এই বিকৃতি ও অবক্ষয় সমগ্র সভ্যতার ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছেন। এভাবেই আমরা এমন এক বিচিত্র সময়ে এসে পৌছেছি যখন ৫২ বছর বয়েসি ছয় সন্তানের বাবা নিজেকে ৬ বছরের বাচ্চা

মেয়ে দাবি করে; যখন ৩০ বছরের এক মহিলা প্রথমে নিজেকে পুরুষ দাবি করে আর তারপর পুরুষ কুকুর; যখন ২৮টি দেশে সমকামি 'বিয়ে'কে বৈধতা দেয়া হয়; যখন শিশুকামিতা ও পশুকামিতাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়; যখন সেইডম্যাসোকিযম, বন্ডেজ, জেন্ডার গেইমসসহ নানা বিকৃতির প্রকাশ্যে উৎসব হয়; যখন আমেরিকাতে বছরে সাড়ে ছয় লক্ষ আর বাংলাদেশে বছরে সাড়ে ৭ লক্ষের ওপর গর্ভপাত হয়; [1] যখন বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়; যখন সিনেমা, সাহিত্য, টেলিভিশন, ইউটিউব সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে নকশা, অধুনা, আর পরামর্শের কলাম সন্তান আর সন্তানদের অভিভাবককে শিখিয়ে দেয় উঠতি বয়সে 'প্রেম করা' আর 'শারীরিক ঘনিষ্ঠতা'—স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। আর যখন এমন কিছু ঘটে যা পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি—পর্নোগ্রাফি ঢুকে পড়ে প্রতিটি ঘরে, চলে আসে প্রতিটি মানুষের হাতের নাগালে, পরিণত হয় শত বিলিয়ন ডলারের এক বৈশ্বিক ইন্ডাস্ট্রিতে। আর সেক্সুয়াল রেভোলুশানের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে অ্যামেরিকার কিন্ডাগার্টেন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের 'অধুনা'-র পাতাতে।

এ তো গেল আমাদের বর্তমান আর এই বর্তমানের শেকড়ের কথা। কিন্তু এই বাস্তবতা কীসের উপসর্গ? আর এ বর্তমান কোন ভবিষ্যতের আভাস দেয়? এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। বর্তমানকে দেখতে হবে ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে।

# [খ] অবক্ষয়কাল

## অতীত

ইতিহাসের দিকে তাকালে সভ্যতা ও যৌনতার সম্পর্কের একটা প্যাটার্ন দেখা যায়। বারবার বিভিন্ন সভ্যতায় এই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

প্যাটার্নটা কী?

সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলোজিস্ট জন ড্যানিয়েল আনউইন ৫,০০০ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ৮৬টি আদিম গোত্র এবং ৬টি সভ্যতার ওপর এক পর্যালোচনা করেন। আনউইন এ গবেষণা শুরু করেন সভ্যতাকে অবদমিত কামনা-বাসনার ফসল হিসেবে দাবি করা ফ্রয়েডিয় থিওরি যাচাই করার জন্যে। কিন্তু ফলাফল দেখে হকচকিয়ে যান আনউইন নিজেই। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত Sex & Culture বইতে দীর্ঘ এ গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন তিনি। বিভিন্ন সভ্যতা ও সেগুলোর পতনে আনউইন দেখতে পান একটা স্পষ্ট প্যাটার্ন—

কোনো সভ্যতার বিকাশ সেই সভ্যতার যৌনসংযমের সাথে সম্পর্কিত। যৌনতার ব্যাপারে কোনো সমাজ যত বেশি সংযমী হবে তত বৃদ্ধি পাবে বিকাশ ও অগ্রগতির হার। সহজ ভাষায় বললে, সভ্যতার বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা স্বাভাবিক যৌনাচার আবশ্যিক। প্রাথমিক বিকাশের পর্যায়ে যৌনাচারের ক্ষেত্রে প্রতিটি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং এর ভিত্তি পারস্পরিক বিশ্বস্ততা।

বিস্মিত আনউইন আবিষ্কার করলেন, সুমেরিয়, ব্যাবলনীয়, গ্রিক, রোমান, অ্যাংলো-স্যাক্সনসহ প্রতিটি সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে এমন সময়ে যখন যৌনসংযম ও নৈতিকতাকে এসব সমাজে কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। কিন্তু উন্নতির সাথে সাথে প্রতিটি সভ্যতায় শুরু হয় অবক্ষয়। সফলতা পাবার পর সভ্যতাগুলো হারানো শুরু করে নিজেদের নৈতিকতা। সাফল্যের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে তাদের মূল্যবোধ, প্রথা ও আচরণ। ক্রমেই উদার হতে শুরু করে যৌনতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি। বহুগামিতা, সমকামিতা, উভকামিতার মতো ব্যাপারগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং একপর্যায়ে এগুলোকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নেয় সমাজ। সামষ্টিক কল্যাণের ওপর ব্যক্তি স্থান দেয় তার নিজস্ব স্বার্থপর আনন্দকে।

যৌনাচার ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, সমাজে এর কোনো নৈতিক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না—আজকের আধুনিক সভ্যতার আধুনিক মানুষগুলোর মতো এ মিথ্যে কথাটা বিশ্বাস করেছিল আগের সভ্যতাগুলোও। অবধারিতভাবেই একসময় সবার ভুল ধারণা ভাঙে, কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যায় অনেক। একবার শুরু হয়ে গেলে আর থামানো যায় না অবক্ষয়ের চেইন রিঅ্যাকশান। অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের সাথে সাথে কমতে থাকে সামাজিক শক্তি। কমতে থাকে সভ্যতার রক্ষণাবেক্ষণ ও উদ্ভাবনের সক্ষমতা। ক্রমশ কমতে থাকে সমাজের মানুষের সংহতি, দৃঢ়তা ও আগ্রাসী মনোভাব। আর একবার এই অবস্থায় পৌঁছবার পর সভ্যতার পতন ঘটে দুটি উপায়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে—অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অথবা আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ।

আনউইন উপসংহার টানেন, বিয়ে-পূর্ববর্তী ও বিয়ে-বহির্ভূত যৌনতা এবং অবাধ ও বিকৃত যৌনাচার যে সমাজে যত বেশি সে সমাজের সামাজিক শক্তি তত কম। যৌনতার ওপর যে সমাজ যত বেশি বাধানিষেধ আরোপ করে, তার সামাজিক শক্তি তত বাড়ে। এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সমাজ হলো যেখানে যৌনতা এক বিয়েকেন্দ্রিক পরিবারের (Heterosexual Monogamy) মধ্যে সীমাবদ্ধ। আনউইনের মতে ৫,০০০ বছরের ইতিহাসজুড়ে, প্রতিটি সভ্যতা ও সমাজের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য।

‘যেকোনো সমাজকে সামাজিক শক্তি অথবা যৌন স্বাধীনতার মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। আর এর পক্ষে প্রমাণ হলো কোনো সমাজ এক প্রজন্মের বেশি এ দুটো একসাথে চালিয়ে যেতে পারে না।’

আনউইনের এই উপসংহারকে বিভিন্নভাবে হয়তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তবে ফিতরাহর ওপর থাকা সুস্থ চিন্তার কোনো মানুষের জন্য সত্যটা স্পষ্ট। এই উপসংহার বিস্ময়কর—বিস্ময়ের কারণ হলো এত দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে একই চক্রের পুনরাবৃত্তি চলছে। কিন্তু এ উপসংহার অপ্রত্যাশিত না। আসুন দেখা যাক, আনউইনের গবেষণা থেকে আসলে আমরা কী কী জানতে পারছি।

সমাজে ফাহিশা (অশ্লীলতা ও বিকৃতি) ও যিনা বাড়লে ভাঙন ধরে পরিবার এবং মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোতে। এর প্রভাব পড়ে সামাজিক সংহতি এবং সমাজের অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তির ওপর। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করে সমাজ। প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সমাজ ও সভ্যতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে অপরিবর্তনীয় কিছু নিয়মাবলি। পার্থক্য হলো প্রকৃতির ক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই নিয়মগুলোর অস্তিত্ব আমরা ধরতে পারি। সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতটা সহজ হয় না। কিন্তু যিনি জোয়ার-ভাটা, দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্মের নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তিনিই বেঁধে দিয়েছেন মানবসমাজ ও সভ্যতার নিয়মগুলোও। আর তাই এই নিয়ম ভঙ্গ করার পরিণতি আছে।

নৈতিকতা, যৌনতার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা, তার অবাধ্য হওয়া শুধু ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলে না; বরং প্রভাব ফেলে পরিবার, সমাজ ও প্রজন্মের ওপর। এর মূল্য চোকাতে হয় সবাইকে। আল্লাহ অনুমোদন দেননি এমন যেকোনো যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া ও মেনে নেয়া নিস্তেজ করে সমাজের উদ্যম, অনুপ্রেরণা ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে। শুরু হয় এক চেইন রিয়্যাকশন। ক্রমশ বেড়ে চলা বিকৃতির প্রতি শূণ্য হতে শুরু করে মানুষের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া। এক সময় বিকৃতি পরিণত হয় প্রচলন ও প্রথায়।

## বর্তমান

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু বোকা মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। চিনতে পারে না অবক্ষয়ের কালে সভ্যতার পচন ও আসন্ন পতনকে ।

আজ বিশ্বজুড়ে যে যৌন উন্মাদনা, বিভিন্ন ধরনের যৌনবিকৃতির স্বাভাববিকীকরণ, আদর্শিক ও আইনি বৈধতা দেয়ার প্রবণতা আমরা দেখছি তা ইঙ্গিত দেয় সেই একই পরিণতির পুনরাবৃত্তির। অন্য সভ্যতাগুলোর মতোই আমাদের এ যৌন উন্মাদনা হলো সভ্যতার অবক্ষয় ও আসন্ন পতনের চিহ্ন। বিশেষ করে পুরুষত্বের ধারণাকে আক্রমণ করা এবং অ্যান্ড্রোজিনির (হাল আমলের

ট্র্যান্সজেন্ডার আন্দোলন) দিকে যাবার প্রবণতা চরম পর্যায়ের অবক্ষয়ের চিহ্ন।

বর্তমান সময়ের পশ্চিমের ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনা নিয়ে খুব সুন্দর বলেছেন ক্যামিল পা'লিয়া। মহিলার প্রথম বই ছিল পশ্চিমা সভ্যতার শিল্পের ইতিহাসে অবক্ষয়—বিশেষভাবে যৌন অবক্ষয় নিয়ে। পা'লিয়ার মতে প্রত্যেক বড় বড় সভ্যতার মধ্যে এ চক্র দেখতে পাওয়া যায়। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে মহিমান্বিত করা হয় পুরুষত্বকে। কিন্তু অবক্ষয়ের পর্যায়ে সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করে পুরুষত্বের বদলে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। রোমান সভ্যতার শুরুর দিকের ভাস্কর্যগুলো যুদ্ধংদেহী, অ্যালফা-মেইল (Alpha Male)। শেষের দিকে জয়জয়কার আঁকাবাঁকাভাবে দাঁড়ানো মেয়েলি ডেইভিডদের।

বিভিন্ন সভ্যতার ক্ষেত্রে এই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি হয়। অবক্ষয়ের পর্যায়ে এসে সভ্যতাগুলোর মধ্যে পুরুষত্ব, পরিবার, যৌনসংযমের বদলে মহিমান্বিত করা হয় যৌনবিকৃতিকে। হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ঘটে সমকামিতা, উভকামিতা, অজাচার, পশুকামিতা, স্যাইডোম্যাসোকিযম, বন্ডেজ, জেন্ডার গেইমসসহ বিভিন্ন যৌনবিকৃতির। বিকৃত আচরণগুলো অর্জন করে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।

অবশ্য ওই সভ্যতার মানুষ এগুলোকে অবক্ষয় ও পতনের চিহ্ন হিসেবে দেখে না; তাদের কাছে এগুলোকে মনে হয় নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। অ্যারিস্টোক্র্যাটিক, অভিজাত মুক্তচিন্তা। যৌনতার ব্যাপারে এমন মুক্তবাজারি দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা সংজ্ঞায়িত করে প্রগতি আর উন্নতির নামে। এটাকেই তারা মনে করে সভ্যতার মাপকাঠি। কিন্তু ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে দেখা যায়, এই সভ্যতা আসলে তার নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়া সভ্যতা এবং এ সভ্যতার নাগরিকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে নিজ শরীর ও সত্তার ব্যাপারে। এ সভ্যতা নিজের পুরুষত্বকে প্রশ্ন করছে, প্রশ্ন করছে নিজের পরিচয়কে। যা কিছুর মাধ্যমে সভ্যতা একসময় মাহাত্ম্য অর্জন করেছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তার ছিটেফোঁটা এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু অবক্ষয়কালের মানুষ হারিয়ে ফেলেছে এর সাথে সব সম্পর্ক।
পশ্চিমের বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে কথাগুলো খাপে খাপে মিলে যায়, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষেত্রে ঠিক এ ব্যাপারটাই ঘটছে। এ অবক্ষয়ের শুরুটা হয়েছে সেক্সুয়াল রেভোলুশানের মাধ্যমে যখন একটি প্রজন্ম নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দিক দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণভাবে আগের প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এবং সব ধরনের বাঁধন খুলে ফেলে যৌনতাকে দিয়েছে মানুষের ওপর অনিয়ন্ত্রিত রাজত্ব।

পশ্চিমে এ ব্যাপারটা ঘটেছে ষাট ও সত্তরের দশকে। আর আমাদের মতো 'মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাওয়াদের' ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে এখন। যার সাক্ষ্য দেয় আমাদের সমাজে এখন চলা যিনা, গর্ভপাত, পরকীয়া, সমকামিতা, পর্নোগ্রাফি এবং ধর্ষণের নীরব মহামারী।

এ সভ্যতা, যা আমরা মুসলিমরা বেছে নিইনি, যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে—আমরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যাকে ভালোবাসতে এবং এ ভালোবাসাকে উন্নতি ও প্রগতি মনে করতে শিখেছি—তা আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায়। ৫,০০০ বছরের ইতিহাস তা-ই বলে। পতনোন্মুখ এক সভ্যতার শেষ প্রান্তে অবস্থান করছি আমরা। পেছনে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস, রোম আর বাইনযেন্টাইনের ইতিহাস। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই একই চক্রের, একই প্যাটার্নের। কিন্তু আমরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত, এত অসুস্থভাবে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপরিচয়ের সংকটে এতটাই নিমগ্ন যে, পচনের গন্ধ আমরা টের পাই না। পতনের শব্দ শুনতে পাই না। বর্তমানমুগ্ধতা আর ক্ষমতার উপাসনা করার প্রবণতা অন্ধ করে রেখেছে আমাদের। আমরা এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি যে ক্যানভাস, কাগজ আর রঙের খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মূল ছবিটা দেখতে পারছি না। আমাদের ঘোরলাগা চোখে রঙের বিস্ফোরণ ধরা পড়ে, কিন্তু ধরা দেয় না বাস্তবতার অবয়ব।

এ সভ্যতার সাথে মানিয়ে নেয়ার আমাদের সব 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম' চেষ্টা, যেগুলোকে আমরা 'প্রগতি' আর 'বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ' বলি—পশ্চিমের অনুকরণ, পশ্চিমের ছাঁচে ইসলামকে নতুনভাবে ফ্রেইম করা, সবকিছুকে ধরে ধরে ইসলামীকরণ করার আমাদের

মহাকৌশলী পরিকল্পনা, ‘ইসলামী’ গণতন্ত্র আর ব্যাংকিংয়ের মতো ধারণাগুলোর বৈধতা দেয়ার কূটতর্কের কারুকাজ, পদে পদে পশ্চিমের সাথে মানিয়ে নিতে নিতে নিজেকে বদলে ফেলা—এসবই হলো এমন এক দালানকোঠার দেয়াল রং করার মতো, যা এরই মধ্যে আগুনে পুড়ে ধসে পড়তে শুরু করেছে।

## ভবিষ্যৎ

চূড়ান্ত পরিণতি কী?
কী অপেক্ষা করছে এ সভ্যতার জন্য?

আমরা অবশ্যই ভবিষ্যৎ জানি না, কিন্তু ৫,০০০ বছরের ঐতিহাসিক প্যাটার্ন থেকে একটা ধারণা করা যায়—

১) অরাজকতাপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা, অথবা
২) অধিকতর সামাজিক শক্তির অধিকারী আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ

যৌনাচারের ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এখন দেখছি অবধারিতভাবেই তা এমন এক বিভ্রান্ত প্রজন্মের জন্ম দেয় যারা না নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, আর না পারে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে। অবক্ষয়, অবনতি, অরাজকতা, অযোগ্যতা আর ভীতসন্ত্রস্ত নিষ্ক্রিয়তার এক চক্রে আটকা পড়ে সভ্যতা। আত্মপরিচয়ের সংকটে ঘুরপাক খাওয়া আত্মরতিতে নিমগ্ন ভোগবাদী প্রজন্মের ঘোরলাগা চোখের সামনে খুলে আসে সমাজের বাঁধন। ধসে পড়তে শুরু করে সভ্যতা।

অথবা এমন কোনো জাতির আবির্ভাব ঘটে যারা ত্বরান্বিত করে একসময়কার শক্তিশালী ও গর্বিত কিন্তু বর্তমানে অধঃপতিত জাতির পতনকে, পরিপূর্ণ করে ধ্বংস প্রক্রিয়াকে। বারবেরিয়ান, ভিসিগথ, হান, মঙ্গোল, ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব বেদুইন।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অবক্ষয়কালে কারা হবে এই আগ্রাসী বাহ্যিক শত্রু?

আধুনিক পশ্চিমা ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের বহু আগেই সভ্যতার পালাবদল আর জাতিগুলোর উত্থানপতনের চক্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইসলামী ইতিহাসের মহিরুহ ইবনু খালদুন। আগ্রাসী ও বিজয়ী জাতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা আল-মুক্কাদিমাতে।

ইবনু খালদুনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা হলো সামাজিক সংহতি। এটি হলো সেই বন্ধন যা একটি সমাজের মানুষের মধ্যে তৈরি করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহায়তার মনোভাব। এ বন্ধন মানুষকে জোগায় প্রতিকূলতার মোকাবেলা আর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি। সাধারণত এ বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী হয় গোত্রীয় সমাজগুলোতে। কারণ, এ সমাজগুলোর ভিত্তি হয় রক্ত-সম্পর্কএবং আত্মীয়তার বন্ধন। তবে এরচেয়েও শক্তিশালী বন্ধন হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ, যার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় খুব অল্পসংখ্যক মুসলিমরা পরাজিত করতে পেরেছিলেন গোত্রীয় আরব মুশরিকদের। সামাজিক সংহতির এ ধারণার আলোকেই ইতিহাসের চক্রকে ইবনু খালদুন ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

শক্তিশালী সামাজিক সংহতি-সম্পন্ন জাতি আক্রমণ করে বিলাসব্যসনে মগ্ন, আধুনিক, শহুরে সভ্যতাকে। অধিকাংশ সময় এ আক্রমণকারীরা হয় রুক্ষ, যাযাবর, দরিদ্র। তাদের থাকে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বন্ধন, অধিকতর প্রাণশক্তি, মনোবল এবং তুলনামূলকভাবে অল্প বৈষয়িক সম্পদ। অন্যদিকে প্রচুর বিত্তবৈভবের মালিক হলেও জীবনের প্রতি নির্লিপ্ত উদাসীনতা আর আধ্যাত্মিক আলস্যে ভোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী। নিজেদের রক্ষা করার মতো সামাজিক সংহতি আর যুদ্ধংদেহী মনোভাব থাকে না তাদের। সুবিধাজনক শহুরে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে এসবের প্রয়োজনও হয় না। তারা ব্যস্ত থাকে সস্তা সুখের নানা আয়োজনে, ভোগ আর অবক্ষয়ে। অবধারিতভাবেই আক্রমণকারীরা বিজয়ী হয়, স্থাপন করে নিজেদের আধিপত্য। তারপর একসময় তারাও গা ভাসিয়ে দেয় সহজ জীবনের সহজিয়া আনন্দের স্রোতে। ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে তাদের সংহতি আর নৈতিক শক্তি, ভাঙন ধরে সমাজে। দিগন্তে উদয় হয় নতুন কোনো জাতি, নতুন কোনো আক্রমণকারী। চলতে থাকে পালাবদলের চক্র।

ইবনু খালদুন এর ভাষায়,

‘...বিলাসব্যসন চরিত্রের মধ্যে নানা প্রকার দোষ, শৈথিল্য ও বদভ্যাসের জন্ম দেয়... সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সেই সচ্চরিত্র অন্তর্হিত হয়, যা একসময় তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য গুণ ও নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তা ত্যাগ করে তারা যখন অসৎ চরিত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই ক্ষয় ও দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আল্লাহর সৃষ্টিতে এ নিয়মই বিদ্যমান। ফলে সাম্রাজ্যে ধ্বংসের প্রারম্ভ সূচিত হয়ে তার অবস্থা বিশৃঙ্খল হয় ওঠে এবং তার মধ্যে ক্ষয়ের সেই সুপ্রাচীন ব্যাধি দেখা দেয়, যাতে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।’ [‘রাজশক্তির স্বভাব যখন গৌরব, বিলাসব্যসন ও স্থিরতায় সুদৃঢ় হয়, তখনই সাম্রাজ্যে ক্ষয় দেখা দেয়’, আল মুকাদ্দিমা, ইবনু খালদুন]

নগরবাসীরা সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, বিলাসব্যসন, পার্থিব উন্নতি লাভের আশা ও তাকে ভোগ করার স্পৃহা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এর ফলে তাদের জীবাত্মা অসৎ চরিত্র ও অন্যায় প্রসঙ্গের মধ্যে কলুষিত হয়ে ওঠে। এভাবে তারা যতই তাতে নিমজ্জিত হয়, ততই সৎপথ ও ন্যায়পন্থা থেকে দূরে সরে যায়। এমনকি এর ফলে তাদের মধ্যকার সংযমের আচার-আচরণও তাদের অবস্থাগুলোতে দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে। [‘প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততায় অধিকতর নিকটবর্তী’, প্রাগুক্ত]

(বর্বর গোত্রগুলো) প্রাধান্য বিস্তারে অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং অন্যদের নিকট যা কিছু আছে, তা ছিনিয়ে নিতে অধিকতর পারঙ্গম। যখনই তারা প্রাচুর্যের সাথে পরিচিত হয় এবং সচ্ছলতার মধ্যে জীবনের ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হয়, তখনই তাদের প্রান্তরবাস ও বন্যপ্রকৃতি হ্রাস পাওয়ার অনুপাতে তাদের শৌর্যবীর্যও হ্রাস পায়। [‘বর্বর জাতিগুলো প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান’, প্রাগুক্ত]

ইবনু খালদুনের এ বিশ্লেষণ থেকে বিজয়ী জাতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। তারা হবে অধিকতর সামাজিক সংহতি, নৈতিক ও প্রাণশক্তির অধিকারী। অতি সংবেদনশীল আধুনিক রুচির বিচারে সম্ভবত একটু বেশি রুক্ষ ও কর্কশ। আমাদের কাছে তাদেরকে মনে হতে পারে পশ্চাৎপদ, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সাদামাটা এমনকি উগ্র। মূল্যবোধ ও যৌনতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তারা কঠোর সংযমী, কট্টর। সভ্যতার বিলাসব্যসন, অবক্ষয় ও অধঃপতনের বিষ থেকে মুক্ত। যুদ্ধংদেহী, বেপরোয়া, লড়াকু, কষ্টসহিষ্ণু।

এখানে যে বিষয়টা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, অধঃপতিত সভ্যতাকে যারা জয় করে তারা চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধিকতর সংহতি ও সামাজিক শক্তির কারণে বিজয়ী হয়। নিছক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, অর্থনীতি কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হবার কারণে না। তাদের বিজয়ের কারণ হলো ক্ষয়িষ্ণুসভ্যতার ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া। এ কারণেই অ্যামেরিকার পতনের পর বিশ্বমঞ্চে প্রধান শক্তি ও নতুন সাম্রাজ্য হিসেবে চীন কিংবা রাশিয়ার আবির্ভাবের ব্যাপারে অনেকের প্রচার করা ও পছন্দের বিশ্লেষণ ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নের সাথে মেলে না।

অ্যামেরিকার পতন হলে চীন এবং রাশিয়ার আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব নিঃসন্দেহে বাড়বে। একটা সময় পর্যন্ত, একটা নির্দিষ্ট মাত্রায়। কিন্তু শতবর্ষের নতুন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা তারা গড়ে তুলবে পারবে বলে মনে হয় না। সভ্যতার পতন ও রূপান্তরের পর্যায়ে বড়জোর সাময়িক একটা ভূমিকা থাকতে পারে তাদের। কারণ, যে দুর্বলতাগুলো আধুনিক পশ্চিমে বিদ্যমান সেগুলো বিদ্যমান চীন এবং রাশিয়াতেও। এ যৌনবিকৃতি, এ উন্মাদনা, সামাজিক সংহতি ও শক্তির এ দারিদ্র্য থেকে তারা মুক্ত না। আজকের চীন এবং রাশিয়াকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার চেয়ে মৌলিকভাবে আলাদা বলা যায় না।

চীন ও রাশিয়া আধুনিক পশ্চিমের মতো ইউরোপীয় শেকড় থেকে বের হয়ে আসেনি, তাদের আছে হাজার বছরের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এটুকুপার্থক্য আছে। কিন্তু এ পার্থক্য কেবল সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত। আদর্শ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বস্তুবাদী, ভোগবাদী, আত্ম-উপাসনায় মগ্ন আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অধিবাসীদের সাথে চীন কিংবা রাশিয়ার খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাই যুক্তি বলে এভাবে চললে তাদের পরিণতিও অভিন্ন হবার কথা।

একইভাবে এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী পশ্চিমের চিন্তা ও পদ্ধতিগত অনুকরণ করে চলা মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন আন্দোলনগুলোর কাছ থেকেও বিজয়ের আশা করা যায় না। কারণ, এ আন্দোলনগুলো সভ্যতার ব্যাধি থেকে মুক্ত না, হতেও চায় না। বরং এ ধরনের চিন্তার লক্ষ্য হলো আরও বেশি করে চলমান বিশ্বব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো, সিস্টেমের অংশ হওয়া। তারা সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম না। এবং ধীরে হলেও তারাও একসময় অবধারিতভাবে আক্রান্ত হবে সভ্যতার সুপ্রাচীন ব্যাধিতে। যার অনেক বাস্তব প্রমাণ এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আবারও বলছি, আমরা ভবিষ্যৎ জানি না; গ্বাইবের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই। ইবনু খালদুনসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকদের তুলে ধরা বিশ্লেষণ সভ্যতার পালাবদলের ব্যাপারে আমাদের একটা জেনারেল থিওরি দেয়। কিন্তু প্রতিটি জাতির উত্থানপতন আর ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকের পেছনে সক্রিয় থাকে আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর। তাই মূল তত্ত্ব থেকে এদিক-সেদিক হতে পারে, হওয়াটাই স্বভাবিক। কিন্তু সার্বিকভাবে এ প্যাটার্ন টিকে থাকার কথা। সেই সাক্ষ্যই দেয় ৫,০০০ বছরের ইতিহাস। পাশাপাশি ৩০ বছরের ব্যবধানে আধুনিক চোখে রুক্ষ, উগ্র, যাযাবর, পশ্চাৎপদ কিছু মানুষের হাতে পরপর তিনটি যুদ্ধে আমাদের সময়ের দু-দুটো সুপারপাওয়ারের বিস্ময়কর পরাজয়ও সভ্যতার এ অমোঘ পালাবদলের প্রাথমিক পর্বের ইঙ্গিত দেয় কি না, সে প্রশ্নও করা যায়।

আল্লাহর নির্ধারিত সিদ্ধান্ত আসার আগে এ প্রশ্নগুলোর নিশ্চিত কোনো উত্তর দেয়া সম্ভব না। বাস্তবতার আলোকে নিজস্ব বিবেচনাবোধ অনুযায়ী সম্ভাব্য উত্তরগুলো থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে আমাদের। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, পতনের কালে বেঁচে আছি আমরা। আমরা বেঁচে আছি মহাকাব্যিক পটপরিবর্তনের সময়ে, যখন সবকিছু ভেঙে পড়ে আর তারপর ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতার নতুন সৌধ। কালের অমোঘ স্রোতে হারিয়ে জেতে না চাইলে ইতিহাসের ভাঙাগড়ার এ পর্বে, এ অবক্ষয়কালে একটা পক্ষ আমাদের বেছে নিতেই হবে।

* * *

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_statistics_in_the_United_States, https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1016/j.ijgo.2014.03.015